KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : অনুরাগ প্রকাশনী, ৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কল- ২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
Title : অনুরাগ (ANURAAG)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 3, 4, 5, 6	Year of Publication : আশ্বিন ১৪০১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ মে ১৯৯৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : মীরা ভট্টাচার্য	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

অনুরাগ

চতুর্থ সংকলন : পৌষ ১৪০১

প্রতিষ্ঠাতা ঃ বিশ্বনাথ ঘোষ। সভাপতি ঃ উদিতেন্দ্রপ্রকাশ মল্লিক
পৃষ্ঠপোষক ঃ শান্তি রায়, দীপালি চৌধুরী, অপরেশ সেন, কমলপাণি রায়চৌধুরী।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অনুরাগ

চতুর্থ সংকলন ঃ পৌষ ১৪০১ বঙ্গাব্দ

জানুয়ারি ১৯৯৫

উপদেষ্টা ঃ প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সম্পাদক ঃ ধীরা ভট্টাচার্য

সহযোগী ঃ জয়ন্তী সান্যাল, বিউটি মজুমদার, মীনা বসু, অর্চিতা রায়চৌধুরী

সাংগঠনিক-প্রধান ঃ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুরাগ প্রকাশন
৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকতা-৭০০০২৬

অনুরাগ

দ্বিতীয় বর্ষ । প্রথম সংখ্যা । পৌষ ১৪০১

সূচীপত্র

রাগানুগ । হিন্দী ভাষা	৩
মতামত	৪
সংস্কৃতিময় বাংলা ভাষা । উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক	৫
বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ । তেজেন্দ্রলাল মজুমদার	৫
হালের বাঙালি সংস্কৃতি । প্রীতিমাধব গুপ্ত	৬
গুরু দেবতা না পিশাচ ? পঙ্কজ ভট্টাচার্য	৯
স্মরণীয় । নিতাইচন্দ্র দত্ত	১৪
আমেরিকায় বাঙালির ভাষা সমস্যা । কৃষ্ণা রায়	১৮
মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন । বিমলকুমার ভট্টাচার্য	২০
ডায়রীর পাতা থেকে । ধীরা ভট্টাচার্য	২৪
রোমাণ্টিক চিন্তাবিদ । ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬
বাঙালির ভাগ্য কথা । বিশ্বনাথ ঘোষ	৩১
দেখি বাংলার মুখ । প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৩৩
কেমন আছি । সনৎকুমার মিত্র	৩৪
চৌদ্দশত সাল । মঈনুল ইসলাম চৌধুরী	৩৩
আসা যাওয়ার পথে । বিউটি মজুমদার	৩৫
ইচ্ছে হয় যাই । শশধর ভট্টাচার্য	৩৬
ফিরে পাওয়া । শুভ্রা মুখোপাধ্যায়	৩৭
শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে । সুপ্রিয় বাগচী	৩৭
রাখাল বালক বাঁচিয়ে দিল হাজার প্রাণ । রেখা পাল	৩৮
মহিম হালদার স্ট্রীটের ছেলে । পুলকেশ শাণ্ডিল্য	৩৯
পুস্তক পরিচয় । কৃষ্ণ স্বামী	৪০

সত্য প্রেস ১০/এ প্যারীমোহন সুর লেন, কলি-৬ থেকে মুদ্রিত
পাঁচ টাকা

রাগানুগ হিন্দিভাষা

শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন, 'বাঙালি ভদ্রলোকের অবজ্ঞা ছিল উত্তরাপথের হিন্দি ভাষাভাষীদের উপর।' (শারদীয় দেশ ১৪০১ পৃষ্ঠা ১৩৩) অথচ আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর এই কথা ঠিক মিলছে না। আমরা দেখছি, কলকাতায় পশ্চিবঙ্গের অন্যান্য শহরে এবং গ্রামেও বহু অবাঙালি, এমনকি খাস উত্তর প্রদেশের, বিহারের, মধ্যপ্রদেশের বহু বহু লোক করেকর্মে খাচ্ছে। তাদের জীবিকায় বিন্দুমাত্র বাধা পাচ্ছে না। বরং বাঙালিরাই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কাজকর্মে শিক্ষাদীক্ষায় প্রচুর বিপত্তির মধ্যে পড়ছে। এসবকে আমরা খুব একটা গণ্য করতে চাই না। কারণ, ভাইয়ে-ভাইয়ের কিঞ্চিৎ কলহ কোথায় না আছে ?

আমাদের প্রশ্ন বাংলা ভাষাকে নিয়ে। ভারতবর্ষে আজ হিন্দির বড়ই অযৌক্তিক দাপট। এটা বন্ধ না হলে অচিরেই আমাদের জাতীয় সংহতি নতুন করে চোট খেতে পারে। আমাদের এই আশঙ্কার জন্যেই আমরা সরকারের কাছেও আবেদন জানাব যেন তাঁরা ভারতীয় সমস্ত ভাষাকেই সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার নীতি গ্রহণ করেন, আঞ্চলিক ভাষা বলে তাদের অনাদর অগ্রাহ্য না করেন। সব ভাষাই ভারতীয় ভাষা, কোন ভাষাই 'আঞ্চলিক ভাষা' নয়। এ অপবাদ দূর করা অতি প্রয়োজনীয়।

হিন্দি ভারতবর্ষের বেশির ভাগ লোকের কথ্য ভাষা। বহু বাঙালি হিন্দি ভাষা শিখেছে, এখনো শিখছে। তাতে আমাদের আপত্তি নেই। 'অনুরাগ' চায় বাংলা ভাষার যেন অনাদর না হয়। 'অনুরাগ' বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার প্রহরী। সে তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে চায়।

মতামত

অনুরাগ পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঘোষের লেখা "ঠাকুর বাড়ীর ইতিকথা" পড়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম। দ্বারকানাথ ঠাকুরের দুশো বছরে ছড়ানো তাঁর পাঁচ পুরুষের নান্দনিক, রাজনৈতিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে চিন্তাধারার বিরাট কাহিনীকে এত অল্প কথায় নিপুণভাবে বিশ্বনাথবাবু যে প্রকাশ করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

সুজাতা ভট্টাচার্য, কলকাতা—২৯

...'অনুরাগ' প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষের সঙ্গে আমার প্রায় অর্ধশতাব্দীর সম্পর্ক। তিনি আমার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। নানা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগে আমরা পাশাপাশি থেকেছি। 'ঠাকুরবাড়ির ইতিকথা'য় তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পাঁচ পুরুষের খবর জানিয়েছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও রচনাটি তথ্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। গজেন্দ্রকুমার ঘোষ সুইডেন থেকে বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন ও তার জন্য সুইডেন সরকারের অনুদান পান জেনে ভালো লাগল। তবে ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় আপন প্রাণশক্তিতে, অনুদানের জোরে নয়।

হিন্দির পিছনে সরকার কোটি কোটি টাকা অকাতরে ব্যয় করেছেন কিন্তু তাতে হিন্দি ভাষার প্রকৃত উপকার বা উন্নতি হয়নি। অপরদিকে দীন বাংলার মাতৃভাষা এখনও উপমহাদেশে তার প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছে। তা অক্ষুণ্ণ রাখতে সকলের সবটুকু সামর্থ্য উজাড় করে দেওয়া দরকার। এ কাজে 'অনুরাগ'-এর মতো লিটল ম্যাগাজিনগুলো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

কয়েকটি কবিতাও ভাল লেগেছে। শ্রীপ্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'এক ভাইবোনের গল্প' তথ্যপূর্ণ। ভ্রমণ-কাহিনী পত্রিকাটির আকর্ষণ বাড়াতে পারে। সম্পাদকের রচনায় ঈশ্বর উপলব্ধির গভীরতায় ডুবে যাওয়ার ভয়ে অবগাহন করতে পারলাম না।...

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা—১৪

সংস্কৃতিময় বাংলাভাষা উদিতেন্দুপ্রকাশ মল্লিক

ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃতি বহুকালের। আর সেই সংস্কৃতি থেকেই ভাষা ও তার রূপ। যেদিন উত্তরকাশীর কাছ হতে গোমুখ থেকে পুণ্যসলিলা গঙ্গার উৎপত্তি, যাকে ভক্ত কবি বর্ণনা করেছেন 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, শ্যামবিটপীঘন তট-বিপ্লাবিনী ধুসর তরল তরঙ্গে'—গঙ্গানদীর সেই ধুসর উর্বর মাটি থেকে বাংলার সমুদ্রোচ্ছাস প্লাবিত পলি বাহিত হয়ে যুক্তভাবে শ্যামলা উর্বরা বাংলার ভূমিকে সৃষ্টি করেছিল। বাংলার রূপ তাই তার সংস্কৃতি ও ভাষাকে এক লাজনম্র বধূর রূপ দান করেছে।

আজও আমরা যে বাংলাভাষা ব্যবহার করি তা উত্তরাখণ্ডের সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করে আপন নিজস্ব সংস্কৃতিবান নম্রমধুর ভাষাতে বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সেই সংস্কৃতিবান বাংলাভাষা শুধু বাংলাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখে নি। তা পশ্চিম প্রান্ত থেকে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আপন সংস্কৃতি ও ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। দাক্ষিণাত্যকেও প্রভাবিত করেছে এবং মিলনসেতু গড়েছে।

'অনুরাগ' সেই বাংলাভাষার আজ ধারক, বাহক, পালক ও সেবক। সংস্কৃতিময় বাংলাভাষার প্রসারই তার একমাত্র কাম্য।

বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ তেজেন্দ্রলাল মজুমদার

আমার মনে হয় বাংলা ভাষার সত্যিকারের অবলুপ্তি আজ বহির্বঙ্গের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী কয়েক কোটি প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে চিন্তাজনকভাবে পরিলক্ষিত। বহির্বঙ্গের এই

বাঙ্গালীদের মধ্যে দেশ বিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বাঙ্গালীও রয়েছেন—যাদের দণ্ডকারণ্য প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্পের অন্তর্গত একদা বহির্বঙ্গে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। বহির্বঙ্গের নতুন প্রজন্মের বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা আজ শুধু যে বাংলা লিখতে পারেন না, কিংবা তাঁদের জন্য বহির্বঙ্গে বাংলা শিক্ষালাভের কোনও সুযোগ সুবিধে নেই তা নয়, তাঁরা ক্রমশঃ বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিও বিস্মৃত হতে চলেছেন। নিজেদের মধ্যে সাধারণ কথা বার্তাতেও তাঁরা হিন্দী কিংবা ইংরেজীতে বলতে আরম্ভ করেছেন। তদুপরি এইসব বাঙ্গালী ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের প্রবণতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা দরদী প্রতিটি সংগঠনের জন্য সমস্যার এই ভয়াবহতা হৃদয়ঙ্গম করে এর প্রতিকারে এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করি।

হালের বাঙালি সংস্কৃতি প্রীতিমাধব গুপ্ত

আপনি দশ বছর আগে রিটায়ার করেছেন। এক কালে কবিতা লিখতেন। অফিস এবং সংসারের চাপে মাঝে দশ-পনের বছর কবিতা উড়ে গিয়েছিল। এখন আবার কয়েক বছর থেকে আপনি কবিতায় মনোনিবেশ করেছেন। গল্প উপন্যাস পড়তে পারেন না। সাময়িকীতে কবিতা প্রবন্ধ বেছে পড়েন। আপনি কলকাতায় থেকেও দুর্গা পুজোতে ঠাকুর দেখতে বেরোন না। হঠাৎ এবারে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ট্যাক্সি করে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা পেলেন আপনি।

প্যাণ্ডেল দেখে আপনি চমকে গেছেন। একটা রংয়ের কোম্পানী পুরস্কার দিয়ে পুজোর যেন আরো জমক বাড়িয়েছে।

এ বছর থেকে আবার একটা সিগারেট কোম্পানীও পুরস্কার দিতে আরম্ভ করেছে। কলকাতার দুর্গা পুজোর প্যাণ্ডেল দেখে আপনার মাথা ঘুরে গেছে। আপনি কিছু নিজে এবার দেখলেন আর কিছু নাম শুনে এসেছেন। তার মধ্যে রয়েছে—একডালিয়া, এভারগ্রীণ, বালিগঞ্জ কালচারাল, সমাজসেবী, ম্যাডক্স স্কয়ার, দেশপ্রিয় পার্ক, মুদিয়ালি, নবপল্লী, আদি বালিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস, বাবু বাগান, নর্দার্ন পার্ক, রায় স্ট্রীট, বকুলবাগান, যুবমৈত্রী, ইয়ংস্টার, মোহাম্মদ আলি পার্ক, শিমলা ব্যায়াম সমিতি, বিবেকানন্দ স্পোর্টিং, তেলেঙ্গাবাগান, রামমোহন সম্মিলনী, কুমারটুলি, বাগবাজার, কলেজস্কয়ার, শ্রীভূমি, ফালগুনী। ১৯৪৪ সনে আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর আগে আপনি প্রথম পুজো দেখেন কলকাতায় কুমারটুলিতে। এবারও সেই কুমারটুলির ঠাকুর দেখেছেন কিন্তু ৫০ বছর আগেকার তারা-ভরা আকাশ নেই। সেবারে আপনি 'রূপবাণীতে' পূজারিলীজ 'শহর থেকে দূরে' দেখেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের। আপনার সবই এখন মনে পড়ছে। নামকরা ডেকরাটারদের মধ্যে এবার আছে—ডোমপাড়া কর্মীবৃন্দ, রক্ষিত ডেকরেটার, ধর ডেকরেটার, বাঘা যতীনের পাল ডেকরেটার। লাইটিংয়ে চন্দন নগর। এবারে আলোর খেলার বিষয়ে প্রাধান্য পেয়েছে জুরাসিক পার্ক, বিশ্বকাপ, প্লেগ, বিশ্বসুন্দরী।

প্রতিমা নির্মাণে রয়েছেন মোহনবাঁশী রুদ্রপাল, অলক সেন, রমেশ পাল, নেপাল পাল, গৌরাঙ্গ পাল, রাখাল পাল, শ্রীশ পাল, জিতেন পাল এণ্ড সন্স, যতীন্দ্রনাথ পাল এণ্ড সন্স, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আরো নামকরা শিল্পীদের মধ্যে কলকাতার দুর্গা প্রতিমা নির্মাণে এপর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন নারদ মজুমদার, মীরা মুখার্জী, শানু লাহিড়ী, বিকাশ ভট্টাচার্য, পরিতোষ সেন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল দত্তরায় ও শ্যামল রায়।

বাঙালির দুর্গাপুজো এভাবে একটা শিল্প সংস্কৃতির পরিচয়

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতকিছু দেখেশুনে এখন আপনার তাই মনে হচ্ছে। একেকটা পুজোর বাজেট লাখলাখ টাকা। এ টাকা কে জোগায়? আধমরা বাঙালি জাতি উৎসবে এমন প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় দেয় কিসের জোরে? আপনি চোদ্দ-পনের বছর পরে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে এসব কথা আপনার মনকে তোলপাড় করে তুলছে। আপনি কবি-স্বভাবের মানুষ বলেই ভিড় এড়িয়ে চলতে চান। গা বাঁচিয়ে চলেন। কোথাও ঝগড়া মারামারি দেখলে শতহস্ত দূরে থাকতে চান। এবারে হঠাৎ করে পুজো দেখতে বেরিয়ে আপনার তাই মাথা ঘুরে গেছে বলা যায়। আপনার এক বন্ধুর কথা শুনে আপনি কলকাতার পুজোর এই সাজসজ্জা আর জাঁকজমক নিয়ে ভাবতে থাকেন। পনেরো বছর আমেরিকায় ছিলেন। বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার। তাঁর মতে, যে কোন লোক আমেরিকা থেকে উড়ে এসে কলকাতার চারখানা পুজো দেখলেই খরচ উঠে যাবে।

আরো একটা বিষয় আপনাকে ভাবিয়ে তোলে। তা হচ্ছে বাংলার পুজা সংখ্যা। পুজা সংখ্যার আবার আরো নতুন নাম হয়েছে শারদীয়া সংখ্যা অথবা ফেস্টিভ্যাল নাম্বার। বাংলা ভাষা নিয়ে 'অনুরাগ' রীতিমত সুচিন্তিত। আপনি অনুরাগ পরিচালক গোষ্ঠীকে আশঙ্কিত হতে বারণ করছেন। কারণ আপনি মনে করেন এমন একটা সাহিত্যমেলা পৃথিবীর আর কোন ভাষায় হয় না। আর কোন ভাষায় নেই। ছোট বড় মিলিয়ে কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ, বাংলার বাইরে যত লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন আছে সকলেই পুজা সংখ্যা করার চেষ্টা করে। আপনি একটা সোজা হিসেব করে দেখেছেন এই অসংখ্য পুজা সংখ্যায় প্রায় অর্ধশত উপন্যাস, একশো প্রবন্ধ, দুশো ছোট গল্প এবং এক হাজার কবিতা ছাপা হয়। একটি পুজা সংখ্যাতেই কবিতা ছাপা হয়েছে চল্লিশটি। আপনি নিজে গুনে দেখেছেন। এভাবেই বাংলা সাহিত্যের

কর্মকাণ্ড এগিয়ে চলেছে। সংখ্যায় বাড়ছে। গুণের বিচারক মহাকাল।

বাঙালি সংস্কৃতির আরো একটা জীবন্ত চেহারা এবার আপনার চোখে পড়েছে। তার নাম জীবনমুখী গান। এই গান বাজারে ছেয়ে গেছে। দোকানে দোকানে তার ক্যাসেট বাজছে। এই ক্যাসেট বাজিয়ে দোকান খদ্দের ডাকছে। খদ্দের আসছেও, বাঙালি এ গানকে পছন্দ করে ফেলেছে। আপনার মতে যদিও প্রতুল মুখার্জী অনেক দিন থেকেই এই গান গাইছেন কিন্তু তাহলেও তখন এর বাজার তৈরি হয় নি। পরিমল গোস্বামী যেমন সময়ের আগে রম্য রচনা লিখে বাজার পান নি কিন্তু পরে সৈয়দ মুজতবা আলী বাজার পেয়েছেন। তখন প্রমথনাথ বিশী, দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল, পরে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় সেই সুযোগ গ্রহণ করেছেন। জীবনমুখী গানেরও তেমনি ভাবেই বাজার তৈরি করেছেন সুমন চট্টোপাধ্যায়। এখন প্রতুল মুখার্জীও ভাল চলছে। অজিত পাণ্ডে, নচিকেতা চক্রবর্তী, অঞ্জন দত্ত, তপন সিংহ, কামাল নাসের, মৌসুমী ভৌমিক, শীলাজিৎ, পল্লব কীর্তনীয়া এমনি অনেকেই জনপ্রিয়তা পেয়ে চটুল হিন্দি গানকে ঠেকাতে পেরেছেন। আপনি বাংলা গানের এই কদর দেখে মনে মনে অবশ্যই একটু খুশি হয়েছেন। গোপনে বলে রাখছি, আর কেউ না জানলেও আমি আপনার মনের কথা জানি।

গুরু দেবতা না পিশাচ? পঙ্কজ ভট্টাচার্য

কেন তোমাকে গুরুরূপে শ্রদ্ধা করিব না? তুমি যে এই তনু মন, এই অনাস্বাদিত যৌবনকে অনাবিল আনন্দধারায় স্নান করাইয়াছ। এই দেহমনকে রিপুসকল হইতে উত্তরণ ঘটাইয়া পরমার্থিকতার আলোয় উদ্ভাসিত করিয়াছ। এক সুপ্রাচীন

বটবৃক্ষ যেমন তাহার শতবাহু বেষ্টন করিয়া গ্রীষ্মের নিদাঘ-দহনে পথশ্রান্ত পথিককে তাহার স্নেহ-সুশীতল ছায়া প্রদান করে, তুমিও তেমন তোমার আধ্যাত্মিকতার ছত্রতল দান করিয়া সংসারের ত্রিতাপ হইতে আমায় রক্ষা করিতেছ। তোমার নয়নদ্বয় হইতে চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি সম যে তেজরাশি নির্গত হইতেছে তাহা আমার মনের সকল তমসাকে দূরীভূত করিয়া আমার অজ্ঞানতা-জনিত অন্ধকারকে জ্ঞানের আলোকে প্রতিভাত করিতেছে। তোমার যে গৈরিকজটা মস্তকোপরি হইতে সর্পিল গতিতে নামিয়া আসিতেছে তাহা এক অপরূপ আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন। তোমার শুভ্র বসন শুচিতার পরিচায়ক। পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে আমার পার্থিব দেহের জন্ম হইয়াছে, আর তব প্রদত্ত বীজমন্ত্রে ব্রহ্মক্রোড়ে আমার আধ্যাত্মিক দেহ জাত হইয়াছে। তাইতো, স্বর্গ-ধর্ম-তপ সম পিতা এবং স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়, সমধিক শ্রদ্ধার্ঘ্য তোমাকেও অর্পণ করি। 'ব্রহ্মবৈবর্ত' মহাপুরাণে পাই,

"যথা পুত্রস্তথাশিষ্যো ন ভেদ পুত্র-শিষ্যয়োঃ।
তর্পণে পিণ্ডদানে চ পালনে পরিপোষণে॥
যথাগ্নিদাতা পুত্রশ্চ তথা শিষ্যশ্চ নিশ্চিতম।"

(পুত্রের ন্যায় শিষ্যও গুরুর তর্পণে, পিণ্ডদানে, প্রতিপালনে, পরিপোষণে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমান অধিকারী। পুত্র ও শিষ্য তাই সমতুল্য)।

যে তোমার সান্নিধ্যে আসিয়াছে, সেই তোমার চন্দ্রাতপ আকাশের ন্যায় উদার হৃদয়-রাজ্যের সন্ধান পাইয়াছে। তোমার ব্রহ্মস্বরূপ অমৃতকণ্ঠ হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞান বাক্য ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা সুধা-নির্ঝরিণীর ন্যায় সুখাবহ হইয়াছে। তোমাকে শ্রদ্ধা-সুন্দর নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়াই, পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায় শিষ্য-পুত্রের ফলভার বৃক্ষ নত হইয়াছে, যেন জলভরা শ্রাবণের সমৃদ্ধ নবীন মেঘ নীচে নামিয়া আসিয়াছে। তোমার ব্রহ্মরূপের সম্মুখে

অবস্থানরত শিষ্য ব্রহ্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া তোমা তথা ব্রহ্মের সহিত একটা অভেদ রচনা করে। নিনাদিত করিয়া উঠে—"আমিই তুমি, তুমিই আমি তোমাতে, তাই আমি ব্রহ্মে, আমি ব্রহ্মে, ব্রহ্ম আমাতে, আমিই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি।" অর্থাৎ ব্রহ্মোপরি থাকিয়া ব্রহ্মরূপ দর্শন হয়।

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্ম সমাধিনা।"

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চতুর্থোঽধ্যায়ঃ, শ্লোক ২৪)

এই ভাবেই শিষ্য গুরুকে দেবতার আসনে সমাসীন করে। প্রিয় গুরুকে যদি দেবতা করিতে না পারা যায়, দেবতাকে প্রিয় করা যাইবে কি উপায়ে?

কিন্তু গুরুর যাবতীয় বেশ ধারণ করিলেই, গুরু নাম গ্রহণ করিলেই কি প্রকৃত গুরু হওয়া সম্ভব? আবার গুরু-দীক্ষা প্রাপ্তি হইলেই কি শিষ্যের মন পরম প্রশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়? মেঘমালা বারি দান করে, বসুন্ধরা তাহা গ্রহণ ও ধারণ করে। এই প্রদান গ্রহণ ও ধারণের কোন ক্ষেত্র বিঘ্নিত হইলে সম্পূর্ণ ধারাটিই অসফল হয়। শিষ্যের মধ্যে গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকৃত সঞ্চালন আবশ্যক। যেখানে এইরূপ প্রকৃত সঞ্চালন আবশ্যক, যেখানে এইরূপ প্রকৃত অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেখানেই প্রকৃত গুরু, প্রকৃত শিষ্য ও প্রকৃত শিষ্যত্বের সন্ধান মিলে। গুরু শিষ্যের চিত্তের সন্তাপ হরণ করিবে ইহাই কাম্য; শিষ্যের বিত্ত অপহরণ করিবে ইহা অনভিপ্রেত। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অধুনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিষ্যের বিত্তহরণকারী গুরুর সংখ্যাই অধিক। এইরূপ ঠগ গুরুর খপ্পরে পড়িয়া অনেক শিষ্যই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। মণির অন্বেষণ করিতে আসিয়া, কাঁচের পুঁতির আলোকে ও চাকচিক্যে অন্য পথগামী হইয়া পাড়ে। অবশেষে গুরু-শিষ্য প্রসঙ্গই তাদের নিকট বিষময় হইয়া পড়ে। এই ধরণের আধ্যাত্মিকতার মুখোশধারী তথাকথিত গুরুকে সনাক্ত

করুন। ইহারা অধ্যাত্ম-পিপাসা মিটাইতে অশক্ত, কারণ ইহাদের মধ্যে কখনই অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয় নাই। ইহাদের ক্ষুব্ধ দৃষ্টি, লোলুপ রসনা, লেলিহান কামনা, লালায়িত বাহুযুগল ও লোভাতুর মন নরনারীকে স্বর্গীয় পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া নরকগামী করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

এই সব ঠগ গুরু হইতে সাবধান থাকুন। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে একাধিক গুরু-কেলেঙ্কারি পাঠ করিয়া সাধারণ মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুরুবাদ সম্পর্কে আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছেন। সম্প্রতি দ্বারকার সনাতন সেবামণ্ডলের মঠাধীশ স্বামী কেশবানন্দজী দুইশত নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্ত হইয়াছেন। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে হরিয়ানা রাজ্যের ওঁরগাঁও প্রদেশের স্বামী আর. কে. চানানাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ব্ল্যাকমেল ও নারীসঙ্গলীলার এক দুষ্ট চক্র আবিষ্কৃত হয়।

একদিকে গুরুর প্রতি অযাচিত সন্দেহ, অন্যদিকে গুরুর উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস এই উভয়ের মুখোমুখি হইয়া পাঠকবর্গ হয়ত বিভ্রান্তিতে উপনীত হইয়াছেন। এহেন বিভ্রান্তি নিরসন-কল্পে তাঁহারা গুরুবাদকে প্রশ্ন করুন। গুরুবাদ যখন প্রশ্নে ভীত হইয়া পড়িবে, এবং বলিষ্ঠ উত্তরদানে অসমর্থ হইবে, তখনই সেই গুরুবাদকে স্বীকৃতি ও প্রাধান্য না দেওয়াই শ্রেয়ঃ। একজন পূর্ণ মস্তিষ্ক ও একজন প্রকৃত আস্তিক স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যুক্তি-বিচার-বিবেচনায় একবার গুরু শিষ্য সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, শিষ্য ক্রমশঃই গুরুর প্রতি আস্থাবান ও শ্রদ্ধাশীল হইয়া উঠিবে—ইহাই কাঙ্ক্ষিত।

'গুরু' শব্দটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাউক। 'গু'—শব্দের অর্থ অন্ধকার, অজ্ঞান, মায়া, অসৎ। 'রু'—শব্দের অর্থ আলোক, জ্ঞান, ব্রহ্ম, সৎ। যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার হইতে জ্ঞানরূপ আলোকের সন্ধান দান করেন, তিনিই গুরু।

'গুরু' শব্দের অর্থ ভার। যিনি শিষ্যের ত্রিতাপে তপ্তভার এবং পঞ্চক্লেশে ক্লিষ্টভার তথা পাপভার গ্রহণ করেন তিনিই গুরু। গুরুত্বের জন্যই গুরু বন্দনীয় ও বরণীয়। তাঁহার তুলনায় সকল কিছুই লঘু ও তুচ্ছ।

অনাচার ও ব্যভিচারই সব নহে। ইহার দাপাদাপি এই ধর্মপ্রাণ দেশে যে পুণ্যস্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজের যত্র-তত্র ছত্রাক গজাইবার ন্যায় প্রতারক ও ঠগ গুরু তথা অসত্যের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া আমরা কেন সদ্-গুরুর সাধনা হইতে বিরত থাকিব? আমাদের আধ্যাত্মিক পিপাসায় তৃষিত হৃদয়কে কেন অধ্যাত্মরসে জারিত করিব না? "চিত্তযোগে যুক্ত না হউক, ভোগে লিপ্ত না হউক, অশ্বমেধে রত না হউক, কান্তাসুখে নিবদ্ধ না হউক, বিত্তে আসক্ত না হউক। কিন্তু যদি গুরুর পাদপদ্মে চিত্ত না লগ্ন হয়, তবে কি হইল?"

"ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিমেধে।
ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরাঙ্ঘি-পদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং,
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং॥"

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যখন গুরু ও শিষ্য উভয়েই সুন্দর, আশ্চর্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটে, অন্যত্র নহে। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু ও ধর্মের প্রকৃত বক্তা, এবং এইরূপ শিষ্যই প্রকৃত শিষ্য ও ধর্মের প্রকৃত শ্রোতা। মুমুক্ষু সাধক ও ভক্ত। আর সকলে ধর্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র।"..."অতীতের সকল ধর্মগুরুকে প্রণাম করি, বর্তমানের সব ধর্মগুরুকে প্রণাম করি, ভবিষ্যতের সমস্ত ধর্ম-গুরুকে প্রণাম করি।" আসুন, আমরাও সেই ধর্মপ্রাণ গুরুকে বন্দনা করি—

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মন্নাথ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ ।
মমাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।
সর্বশ্রুতি শিরোরত্ন-বিরাজিত-পদাম্বুজঃ ।
বেদান্তাম্বুজ-সূর্যো যস্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

স্মরণীয় নিতাইচন্দ্র দত্ত

বিশ্ববরেণ্য, স্বনামধন্য, অস্কার বিজয়ী, চিত্রপরিচালক, সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার সর্বসাকুল্যে মোট চার বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। শুধু এ কারণেই নিজেকে ধন্য মনে হয়। প্রথম দর্শন 'কলিকাতা সমাজ প্রকল্প স্কুল' ১/৪, মনোহর পুকুর সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা-৭০০০২৯, আমি তখন ঐ স্কুলের ছাত্র। সেই স্কুলের সভাপতি, শ্রীমতী কল্যাণী কার্লেকার। তিনি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের পিসতুতো দিদি। সম্ভবত ১৯৮৫ সালে স্কুলের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সকাল ১০টা নাগাদ শ্রীরায়, শ্রীমতী কার্লেকারের সঙ্গে স্কুলে প্রবেশ করলেন; আমি তো বাক্যহারা হয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। মাসীমা (শ্রীমতী কার্লেকার, সবাই ঐ নামেই ডাকতো।) বললেন,—তোমরা চিনতে পারছো? সবাইকে ছাপিয়ে আমিই বলেছিলাম,—হ্যাঁ পারছি। মাসীমা হেসে বলেছিলেন,—বল তো এঁর নাম কি? আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিয়েছিলাম,—শ্রীসত্যজিৎ রায়।

দেখেছিলাম চেয়ারে উপবিষ্ট শ্রীরায়ের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। মাসীমা আবার বললেন,—তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করার থাকলে কর। সবাই চুপচাপ এত কি ভাবছো? ওঁর সঙ্গে আলাপ করবে না? তবু কেউ কোন কথা বলছে না দেখে, হঠাৎ মাসীমা বললেন,—নিতাই কিছু বলো। তার আগে শ্রীরায়ের লেখা, আঁকা ও চলচ্চিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সরাসরি শ্রীরায়কে বললাম,—আপনি তো অনেক ছবি তৈরী করেছেন। আমাদের নিয়ে অর্থাৎ এই স্কুল অবলম্বনে একটা ছবি করুন না! নাকি সম্ভব নয়? শ্রীরায় মোলায়েম সুরে বললেন,—দেখ, আমি এখনো সে রকম ভাবে কিছু ভাবিনি; তবে তুমি বললে, আমার মনে থাকবে। যদি কখনো সময় সুযোগ হয় ভেবে দেখবো, কেমন! এর পরে তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি উত্তর দেবার পরে, আমাকে দেখিয়ে মাসীমা তাঁকে বলেছিলেন,—ও গলপ, কবিতা লেখে। শুনে শ্রীরায় বলেছিলেন,—ও তাই নাকি! বাঃ খুব ভাল। এরপর মিষ্টিমুখ করে তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় দর্শন ম্যাক্সমুলার ভবনে। পথের পাঁচালীর পরিচালকের সম্বর্ধনা সভায়। সেখানে তাঁর সঙ্গে কথা না হলেও খুব কাছ থেকে দর্শন হয়েছিল। সম্বর্ধনা দিয়েছিলেন "পোলার ফ্যান"-এর কর্মকর্তা।

তৃতীয় সাক্ষাৎ শ্রীরায়ের বাসভবনে ১/১, বিশপ লেফ্‌রয় রোডে।

অস্ট্রেলিয়া নিবাসী "মিঃ সী লেথ্ বীজ" দৈনিক 'বর্তমানে' শ্রীরায় সম্পর্কে কারো বিশেষ কিছু জানা বা লেখা থাকলে তাকে পাঠাতে আবেদন করেছিলেন; কারণ তিনি শ্রীরায়ের জীবনী লেখা শুরু করেছেন। আমি আবেদন পত্রটি পড়ে, আমার লেখা দুটি কবিতা "সত্যান্বেষী সত্যজিৎ" "রায়বংশ" এবং সত্যজিৎ সম্পর্কে কিছু পেপার কাটিং তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। আমার

পত্রের উত্তরে "মিঃ বীজ" ধন্যবাদসহ জানিয়েছিলেন যে, তিনি বাংলা পড়তে বা লিখতে জানেন না। আমি যেন আমার বাংলা কবিতা-র ইংরাজী অনুবাদ করে তাঁকে পাঠাই। তাহলে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন। আমার মনে হয়েছিল শ্রীরায় ছাড়া নির্ভুল ইংরাজী অনুবাদ আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। মনের ইচ্ছানুযায়ী ৯১ সালের শেষের দিকে একদিন সকালে আমার লেখা দুটি কবিতা ও "মিঃ বীজ"-এর পত্র নিয়ে হাজির হলাম শ্রীরায়ের বাড়িতে। যথারীতি কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে কলিংবেল টিপলাম। একটি ভৃত্য, দরোজা খুলে জিজ্ঞেস করল,—কাকে চাই? আমি বললাম, সত্যজিৎ রায় আছেন? সে বল্লে,—তিনি অসুস্থ। কারো সঙ্গে দেখা করা ডাক্তারের বারন আছে। তাকে বলি, দেখুন আমি অনেক দূর থেকে এসেছি, তাছাড়া কতগুলো চিঠি আছে তাঁকে দেবার। বলে চিঠিগুলো বের করলাম। সে বল্লে,—আমাকে দিন, আমি দিয়ে দেব। আমি বলি—আচ্ছা ওনার স্ত্রী বাড়িতে আছেন? সে,-হ্যাঁ বলাতে; বল্লাম, তাঁকেই ডেকে দিন। তাঁর হাতে দেব। আমার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে ভৃত্যটি বল্লে,—আপনি চিঠিগুলো আমার হাতে দিন। আর আপনি একটু দাঁড়ান, চিঠি পড়ে তিনি যদি আপনাকে যেতে বলেন তো আপনি ভিতরে যাবেন। অগত্যা আমি তার হাতে সব দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঈশ্বর বোধহয় আমার সহায় ছিলেন। তা না হলে সেই মহাপুরুষের দর্শন পেতাম না। মিনিট পাঁচেক পরে, ভৃত্যটি এসে বল্লে—আপনাকে ভিতরে আসতে বল্লেন।

সোজা তার সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম, শ্রীরায়ের বসার ঘরে। ঘরময় নামী এবং দামী বই। মাঝখানে একটা লেখার টেবিলের সামনে শুভ্র পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত সৌম্যদর্শন শ্রীরায় বসে আছেন। হাতে আমার প্রেরিত "মিঃ বীজ"-এর চিঠি। তিনি আমায় দেখে বললেন,—কি ব্যাপার? উত্তরে বল্লাম,—স্যার, আমি আপনার নামে দুটো কবিতা লিখেছি। তিনি হাতে নিয়ে

পড়লেন। তারপরে বল্লাম—স্যার আপনি যদি কবিতা দুটো ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেন, তাহলে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাতে পারি। শুনে তিনি বল্লেন,—ও তো ('মিঃ বীজ') আমার সম্পর্কে আরো তথ্য চেয়েছে শুধু কবিতা দিলে হবে না। আবার বলি,—স্যার আপনি অনুবাদ-টাই করে দিন। তিনি তাঁর বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেও, মধুর সুরে বল্লেন,—দেখ, আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত আছি আমার একদম সময় নেই। ঠিক আছে, আমি ওঁকে (মিঃ বীজ) ফোনে জানিয়ে দেব তোমার কথা। কেমন! আমি আর কথা বলতে পারিনি। ফিরে আসার সময় তাঁর পায়ে হাত দেবার লোভ সামলাতে না পেরে, প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠলেন,—আরে থাক থাক। বল্লাম,—আসছি। তিনি মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা। পরে অবশ্য শ্রীমতী কার্লেকার আমার কবিতা দুটি ইংরাজীতে অনুবাদ করে দেন, সঙ্গে আমার চিঠিও। আমি সেগুলো অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়েছি। "মিঃ বীজ" তার উত্তরও দিয়েছেন। এই ব্যাপারে প্রায় বছর খানেক তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ হয়েছে। এক পত্রে "মিঃ বীজ" লিখেছেন যে তিনি কলকাতায় এলে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

চতুর্থবারে স্মরণীয় শেষ দর্শন চিরবিদায় বেলায়। তাঁর মৃত দেহ। হাজার হাজার শোকাতুরের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। প্রবল ইচ্ছে ছিল তাঁর চরণ যুগল স্পর্শ করার কিন্তু সম্ভব হয়নি। তাঁর হাসি মুখ যেন বলতে চাইছিল,—"পেয়েছি ছুটি বিদায় দেও ভাই,—সবারে আমি প্রণাম করে যাই"। আমি মনে মনে বলেছিলাম,—"নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই"। মহারাজা তোমারে সেলাম জানাই॥

আমেরিকায় বাঙালির ভাষা সমস্যা

কৃষ্ণা রায়

পশ্চিম বাংলা থেকে প্রায় সাড়ে বারো হাজার মাইল দূরে সুদূর আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের রাজ্য ক্যালফোর্নিয়া। সেখানের এক নামকরা সহর লস্ এঞ্জেলেস। আমেরিকাবাসীরা ভালবেসে সহরটির নাম দিয়েছে 'সিটি অব এঞ্জেলস' সেই সহরে বিগত ১৫ বছর এক নাগাড়ে বাস করার সুযোগ আমার হয়েছে। বিদেশে বসবাস করার সময় ওখানে বাংলা ভাষা শেখার সুবিধে অসুবিধে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি এখানে।

বাংলা ভাষা জানা গোষ্ঠীকে আমি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করছি।

(১) যারা বাংলা শিখে বিদেশে গেছেন।

(২) যারা বাংলা পড়তে পড়তে ছোট বয়সে ওদেশে গেছেন।

(৩) যারা ওদেরই বাঙালির সন্তান হয়ে জন্মেছেন।

প্রথম শ্রেণী-ভুক্তদের সমস্যা বাংলা লেখা বা পড়া নয়—সমস্যা পরবর্ত্তী পুরুষকে কিভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্তদের সমস্যা একটু কম। বিশেষ যত্ন নেওয়া হলে তারা হয়তো শেখা ভাষাটিকে ঘসে মেজে নতুন উদ্যমে বাংলা লেখা ও পড়া চালু রাখতে পারেন। সমস্যা কঠিন তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্তদের নিয়ে যারা বাংলা আদপেই জানেনা। এদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করার চেষ্টা হয়ে থাকে মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে বললাম এ জন্য যে যখনই কোন আগ্রহশীল ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, বাংলা ভাষা শিক্ষা দেবার জন্য চেষ্টা করেন তা মুষ্টিমেয় কয়েকটি ছাত্র সংখ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ফলে বিদ্যায়তনের বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম। দশটি প্রথম শ্রেণীর ছাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশের পর প্রথম শ্রেণীতে শূন্য থেকে ১০ দশ যে কোন সংখ্যার ছাত্র থাকার সম্ভাবনা আছে। কয়েকটি ছাত্র থাকলে তবু সম্ভব। নতুবা প্রথম শ্রেণীতে পাঠের

উপযুক্ত বয়সের ছাত্র হয়তো নেই বা পিতামাতা ইচ্ছুক নন। সুতরাং প্রথম শ্রেণীতেই ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির বদলে হ্রাস পেতে থাকে। এটা বিরাট সমস্যা।

দ্বিতীয়তঃ শিশুরা কিণ্ডার গার্টেন থেকে বলে ও শেখে। কাজেই বাংলা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ জাগার কোনো সুযোগ নেই সেখানে। যদি না নিজের বাড়ীতে বাংলা বলা ও শেখানো হয়। তৃতীয়তঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের ইংরাজী ছাড়া দুটি বিদেশী ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়। যেমন ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, জাপানী ইত্যাদি অবশ্য শিক্ষণীয় করা হয়। সুতরাং—ছাত্রদের তৃতীয় ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা শেখার তাগিদ কমে যায়। অন্যান্য ভাষাগুলোর জন্য বার্ষিক ফলের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হয়। সুতরাং ইচ্ছা সত্বেও অন্য ভাষা শেখার চাপের জন্য বাংলা ভাষা শেখার ওপর নজর দিতে পারেন না।

চতুর্থতঃ আমেরিকার সহরগুলো এতো বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে যে ৬০।৭০ মাইল প্রায়ই লোকে কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে থাকেন। প্রতি পরিবারেই স্বামী-স্ত্রী কর্মরত। ফলে সপ্তাহ শেষে আবার বহুদূরে যাতায়াত করাটা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, কারণ ওদেশে কাজের লোক না থাকায় গৃহের নানা কাজ বাড়ীর লোককেই সম্পন্ন করতে হয়। এটিও একটি বড় অসুবিধে।

সুবিধের ক্ষেত্রে মনে হয় অনেক বাচ্চার দাদু-দিদা, ঠাকুমারা ওদেশে থাকেন। এই সুন্দর সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যদি শৈশবেই কিছু বাংলা শেখানো ও বলানো বাড়ীতেই আরম্ভ করা হয় তাহলে হয়ত প্রথমেই কিছু বাংলা শিখে নেওয়া সম্ভব হতে পারে। অবশ্যই বিশেষ আগ্রহ যেখানে থাকে কোনো অসুবিধাই তার পথ রোধ করতে পারে না।

পৃথিবীর অন্যতম দশটি শ্রেষ্ঠ ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে তার সম্পদশালী শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভারের জন্য।

বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষার মান অতি উচ্চ। ব্রিটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও আমেরিকার শিকাগো সহরে বাংলা সাহিত্য শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে, যেখানে ছাত্ররা বাংলা ভাষা শিক্ষা ও গবেষণা করতে পারেন। আধুনিক সমাজে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ও বলা কওয়াতে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। আধুনিক সমাজে পশ্চিমী কায়দায় চলন-বলনে নিজেদের পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মনে করলেও আমরা কোনোদিনও পুরোপুরি পশ্চিমী হতে পারবনা। এ প্রসঙ্গে দাঁড়কাক ও ময়ূর পুচ্ছের গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে। পরিশেষে বলি "মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।" এ কথা চন্দ্র সূর্যের ন্যায় সত্য। ইতিহাস তা প্রমাণ দেখিয়ে গেছে ও যাচ্ছে।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বিমলকুমার ভট্টাচার্য

আমাদের এই ভারতবর্ষ হল রত্নগর্ভা। রত্ন প্রসবিনী পুণ্যময় এই ভারতে অনেক সাধক, মহামনীষী ও প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। যাঁরা ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁদের দুঃসাহসিক চিন্তা ও কর্মের দ্বারা দেশে এক সামাজিক যুগান্তরের সূচনা করেছিলেন। বলাবাহুল্য এদিক থেকে মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী এই রাহুল সাংকৃত্যায়নের জীবনচর্য্যা ছিল নানা বৈচিত্রে ভরা। অহংকারহীন পাণ্ডিত্যের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত এই স্বয়ং শিক্ষিত নির্লিপ্ত পরিব্রাজকের জীবনদর্শন ও তাঁর রেখে যাওয়া অনন্য কীর্তি হল আমাদের কাছে এক স্মরণীয় ইতিহাস।

উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার পন্দহা গ্রামে ১৮৯৩ সালের ৯ই এপ্রিল মাতামহ রামশরণ পাঠকের ঘরে রাহুলজীর জন্ম হয়। বাবা ছিলেন গোবর্দ্ধন পাণ্ডে আর কুলবন্তী দেবী। উভয়ই ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল ও ধর্মপরায়ণ। মা-বাবার দেওয়া নাম হল কেদারনাথ। মাত্র উনিশ বছর বয়সে জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ সন্তান এই রাহুলজী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরসা মঠে গিয়ে কিছুকাল বৈষ্ণব সঙ্গ করে নিজের নাম পরিবর্তন করে পরিচিত হয়েছিলেন 'সাধুরাম উদারদাস' নামে।

এরপর তিনি সাধক দয়ানন্দ স্বামীর প্রবর্তিত ধর্মাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আর্য সমাজে যোগ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সবই হয় নিষ্ফল প্রয়াস। দীর্ঘদিন সযত্নে বেদ ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করেও এখানে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেলেন না। সুতরাং অতৃপ্তির অবসানও হয়না। গুরু দয়ানন্দের প্রচারিত ধর্মাদর্শের সঙ্গে তাঁর শিষ্যও মোহান্তদের সাধন জীবনে প্রচুর অমিল দেখে তাঁর মনে প্রচণ্ড অনীহা জন্মায়, তিনি তখন আর্য সমাজের সংশ্রব ছেড়ে চলে আসেন।

পার্থিব জীবনে দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিশ্বমানবকে যিনি পরম শান্তির সন্ধান দিয়েছিলেন সেই মহামানব ভগবান বুদ্ধের সাধনাদীপ্ত মহাজীবন ও প্রেমময় বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি এই রাহুলজী এরপর গভীর আকৃষ্ট হন। বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত মৈত্রী ও সাম্যের বাণী এবং তাঁর নির্দ্দেশিত অমূল্য সূত্রগুলি যথার্থ রূপে অনুধাবন করে তিনি জীবন জিজ্ঞাসার প্রকৃত সদউত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। ফলে সার্থক হয় তাঁর আত্মিক অনুসন্ধান। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা পেয়ে অচিরেই তিনি গ্রহণ করলেন এই বৌদ্ধধর্ম। আর এই মহৎ ধর্মে অভিষিক্ত হবার পর থেকেই তাঁর নতুন নামকরণ হল 'রাহুল-সাংকৃত্যায়ন'। এই শেষোক্ত নামেই তিনি বিশ্বজনের কাছে সমধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন।

গতানুগতিক জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে মাত্র নয় বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন এই নবীন সন্ন্যাসী। আর সেই থেকেই তার কঠোর পরিব্রাজক জীবনের শুরু। অদম্য জ্ঞানস্পৃহা ও গভীর অনিসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি স্বদেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত পরিভ্রমণ করেছেন। উদ্দেশ্য একটাই, জীবন ও মানুষের অনুসন্ধান করা। কাশ্মীর থেকে দাক্ষিণাত্যের কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথে ভ্রাম্যমান জীবনে তিনি দর্শন করেছেন অজস্র মঠ, মন্দির, আশ্রম ও বিশিষ্ট ধর্মাচার্য্যগণকে। আর অধ্যয়ন করেছেন সারগর্ভ বহু শাস্ত্র, সংগ্রহ করেছেন অসংখ্য পুঁথি ও ধর্মীয় নিদর্শন, যা তাঁর মহত্তর জীবনকে আজও উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত আলোকিত করে রেখেছে।

মাতৃভাষা ভোজপুরী ছাড়াও তিনি হিন্দী, উর্দু, সংস্কৃত পালি, অসমীয়া, গুজরাটী, মৈথিলী, মারাঠী, তামিল, ও তিব্বতী প্রভৃতি বহু ভাষা জানতেন। তবে এ প্রসঙ্গে জানাই, এই সকল ভারতীয় ভাষা ছাড়াও ইংরাজী, চাইনিজ, রাশিয়ান ও সিংহলী প্রভৃতি আরও অনেক ভাষাতেও তার বেশ দখল ছিল। দেশী ও বিদেশী এই সকল গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আয়ত্ব থাকাতে পরবর্ত্তীকালে অধ্যয়ন ও গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত উপকার সাধন হয়েছে। বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তিনি জীবনে দেড়শোর অধিক গ্রন্থ রচনা, সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন। যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল,—ভোলগা থেকে গঙ্গা, মানব-সমাজ, দর্শন-দিকদর্শন, জয় যৌধেয়, দেব সেনাপতি, নিশা, অমৃতশ্চ, অঙ্গিরা, প্রবাহন, বন্ধুরমল্ল, চক্ররপানি ও নাগদত্ত প্রভৃতি। প্রত্যয়ের সঙ্গে অবশ্যই বলা যায়, তাঁর এই সব মননশীল অসামান্য গ্রন্থরাজি শুধুমাত্র দেশবাসী নয়, সমগ্র মানবজাতির কাছে এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু এই অধ্যয়ন, পর্যটন ও গ্রন্থ রচনাই কেবল তাঁর জীবন-সর্বস্ব ছিল না। মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করতে, অনগ্রসর মানুষের মধ্যে যথার্থ শিক্ষা বিস্তার ও সার্বিক

উন্নতি-সাধনে, অবহেলিত সমাজতন্ত্রের সুষ্ঠ ব্যবস্থার দাবীতে এবং সর্বোপরি জাতিভেদ ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে তিনি নিজেকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করেছিলেন। এর জন্য অবশ্য তাঁকে জীবনে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। সুদীর্ঘ কারাবাস থেকে শুরু করে বহু দৈহিক নির্মম নির্যাতন তাঁকে নীরবে ভোগ করতে হয়েছিল। তবে এসবের বিনিময়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সাফল্যের মুখও দেখেছেন একথাও ঠিকই।

এক সময় অধ্যাপনার আমন্ত্রণ রক্ষার্থে এবং নিজের দুর্বার জ্ঞান অন্বেষণেও তাঁর অধীত জ্ঞানলব্ধ বিষয়গুলি সানন্দে আগ্রহান্বিতজনকে জানাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাড়াও তিনি সসম্মানে বেশ কয়েকবার চীন, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান, শ্রীলঙ্কা, ইরাণ, কোরিয়া প্রভৃতি ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের নানা সমৃদ্ধশালী দেশে গিয়েছেন। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁর এই বিশ্বভ্রমণ আমাদের কাছে অত্যন্ত গৌরবের, একথা অনস্বীকার্য্য।

ভারতীয় মননে, সমাজ চেতনায় ও মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ কল্যাণকর্মে নিবেদিত প্রাণ এই ঋষিকল্প পুরুষ তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল প্রয়াত হয়েছেন। গত বছর তাঁর শুভ জন্ম শতবর্ষও অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু খুবই লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয়, শতবর্ষের আলোয় শতাব্দীর দৃপ্ত সূর্য্য পণ্ডিত সাংস্কৃত্যায়নের বহুমুখী প্রতিভাময় জীবনের প্রকৃত মূল্যায়ন আজও হল না। অথচ এটা আমাদের কাছে জাতীয় কর্তব্যের সমতুল্য। তাই দেশের সকল বর্তমান প্রজন্মের কাছে আমার বিনীত আবেদন রইল, তাঁর উজ্জ্বল আদর্শময় মহান জীবন ও কর্ম যে আজও বিশেষ প্রাসঙ্গিক একথা স্মরণ রেখে তাঁর দুর্লভ প্রতিভার সঠিক মূল্যায়নে আমরা যেন সত্বর সাগ্রহে এগিয়ে আসি। তাহলেই তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানো সর্বাংশে সার্থক হবে।

ডায়রীর পাতা থেকে ধীরা ভট্টাচার্য্য

চমৎকার উপহার, প্রাক উপহারে যে ছিল শুষ্ক প্রাণহীন মরুভূমির মত, উত্তর উপহারে সে হয়ে উঠল সরস প্রাণবন্ত। তার শূন্য হৃদয় পূর্ণ হল। নির্ঝরের স্বপ্ন হল ভঙ্গ, পরিপূর্ণ হৃদয় থেকে বেরিয়ে এল জীবনের মর্মকথা। জীবন চলার পথ যখন শেষ হয়ে আসছে তখন পথ বেঁধে দিল গ্রন্থি। কবি বলেন বন্ধনহীন গ্রন্থি। বন্ধন যেখানে হিয়ায় হিয়ায় সেখানে গ্রন্থি বন্ধনহীন হয় কি করে? ব্যবহারিক জীবনে আমরা অবশ্যই বন্ধনহীন। কিন্তু আত্মিক জীবনে আমরা সবাই একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। জীবনের আনন্দ সবাইকে আরও নিবিড় বন্ধনে বাঁধুক। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা জীবনের শেষের কবিতার প্রায় শেষ পংক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছি। ছন্দ পতন হতেও পারে, ভয় হয়, আবার হয়ও না। ছন্দের শেষে যতি চিহ্ন আঁকার সময় এসেছে। আমি বলি—'আমি আগে যতি টানি' তুমি বল 'আমি আগে'। দেখি কালের পদধ্বনি কে আগে শোনে। অন্ধকার রাতে আমার ভাল লাগে না। নীল আকাশ যখন পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোয় ভরে যায় তখন চাঁদের খুব কাছের তারাটি হয়ে ফুটে উঠতে ইচ্ছে করে·····

২

সুতনুকাকে সেদিন প্রথম দেখেছিলাম রাধাগোবিন্দের মন্দিরে ঢোকার মুখে বাঁ দিকে যে শিবলিঙ্গের মূর্ত্তি আছে সেখানে পূজারতা। অপূর্ব সুন্দরী না হোক সুন্দরী, উজ্জল রং সদ্যস্নাত, প্রসন্ন মুখ। ত্রিপত্র বেলপাতার প্রতিটি পাতায় রক্তচন্দন দিয়ে রামনাম লিখছে শিবলিঙ্গের মাথায় দেবে বলে। আমি দূর থেকে দেখলাম তাকে। বুঝতে চেষ্টা করলাম। শেষে ধীর পায়ে এগিয়ে গেলাম। নাম জিজ্ঞাসা করলাম। বললো সুতনুকা। আমি আবার ফিরে গেলাম। ভাবলাম হয়তো কোন দেবদানকে পাবার

জন্য ধ্যানমগ্ন মহাদেবের কাছে তার সশ্রদ্ধ ভক্তিপূর্ণ কামনা নিবেদন করছে·····

৩

মধ্যাহ্নের রৌদ্র মাথায় করে তার কাছে গিয়েছিলাম কিছু সংবাদ দেওয়ার জন্য। বিষণ্ণ-বদন। কেননা স্ত্রী হাসপাতালে। দুরারোগ্য ব্যাধি, কিন্তু বিষণ্ণতা ছাপিয়ে মুখে ফুটে উঠেছে প্রসন্ন সাত্ত্বিক ভাব, এভাব মুখে ফুটিয়ে তুলতে পারেন একমাত্র সত্ত্বভাবাপন্ন মানুষই। সবের মধ্যে থেকেও সবের বাইরে। এরা নির্লিপ্ত—দুঃখ এঁদের স্পর্শ করে না, সুখ এদের মাতিয়ে তুলতে পারে না, সংসারে থাকেন পাঁকাল মাছের মত, পাঁকে থাকেন অথচ গায়ে কাদা লাগে না·····

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ ঃ
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়ের হাস্যমধুর গল্প
"চিঠিতে চিঠিতে"

লক্ষ্মী বস্ত্রালয়
১০০/এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬
(বসুশ্রী সিনেমার পাশে)
অর্ধ শতাব্দীর উপর সুপরিচিত প্রসিদ্ধ বস্ত্র বিক্রেতা

সাহিত্য সভা
প্রতি ইং মাসের তৃতীয় শনিবারে
সন্ধ্যায় ৩৪/২ মহিম হালদার স্ট্রীটে
অনুরাগের মাসিক সাহিত্য অধিবেশন হয়।
সাহিত্যে অনুরাগীবৃন্দের আমন্ত্রণ রইল।

রোমাণ্টিক চিন্তাবিদ্ ঋতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস বাস্তবিক বোবা নয়। বর্তমানে দাঁড়িয়ে পিছনের দিকে জিজ্ঞাসার সার্চ-লাইট ফেললে ইতিহাসের কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাবে। এমনও দেখা যায় যে, বহু ঘটনার কার্যকারণ হেতু, যা হয়ত সে সময়ে বোঝা যায় না, এই রকম কিছু হাঁটলে অর্থবহ হয়ে ওঠে। কালের কষ্টি পাথরে যাচাই না হলে কোন মতবাদ বা ঐতিহাসিক ঘটনার যথার্থ মূল্যায়নও বোধ করি হয় না। আমরা বর্তমান সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু অতীত সম্বন্ধে একটা ঔদাসীন্য বা বিস্মৃতির মানসিকতা, ঘটনাপ্রবাহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক কালের যে আন্তর্জাতিক ঘটনা আমাদের সবচেয়ে বেশী বিচলিত করে, বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তা হল মহাশক্তিমান সোভিয়েট রাশিয়ার পতন। আরও আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি যে,—আপাতদৃষ্টিতে সোশালিজমের মজবুত বুনদে দাঁড়ানো সোভিয়েট রাশিয়ার সূত্রপাতেই যে বিকাশের বীজ উপ্ত ছিল—এই অমোঘ সত্য প্রায় বছর কয়েক আগেই একজন খাঁটি ভারতীয় বুঝতে পেরে লেখার অক্ষরে ব্যক্ত করে গেছেন।

কেবলমাত্র পারিবারিক ভাবধারার জন্যই নয়, এই মানুষটি আদতে ছিলেন জাত রোমাণ্টিক। রোমাণ্টিকদের মধ্যে বাস্তব সম্বন্ধে একরকম অপূর্ণতা বা অভাববোধ থাকে—আর এই অপূর্ণতা বোধই এদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় সারাটা জীবন। এই রকম সংবেদনশীল, নান্দনিক অনুভূতিতে ভরপুর মনের কাছে একদিন পৌঁছল রাজনীতির ডাক।

১৯২০ সালে কলকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সদ্য আমেরিকা ফেরৎ লালা লাজপৎ রায় এবং আফ্রিকায় অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনকারী গান্ধিজী। গান্ধীজির

অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রকাশ তখনই হতে শুরু করেছে। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ বাস্তব বোধের জন্যে একেবারে প্রথম পদক্ষেপেই খেটে খাওয়া মাটির মানুষদের কাছে পৌঁছে গেলেন। সে সময়, গণ-জাগরণের যে প্রবল ঢেউ উঠল তাতে তৎকালীন শিক্ষিত ভারতীয়দের একটা সিংহভাগই ভেসে গেলেন। এই ভাবুক তরুণটিও রীতিমত গান্ধীভক্ত হয়ে উঠল। তরুণ মনের এই বিপ্লব-চেতনার সঙ্গে পারিবারিক চিন্তা-ভাবনার মিল না হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু ওজর-আপত্তি ওঠে, কিন্তু গান্ধীজির সহজ, সরল, মর্মভেদী, জ্বালাময়ী আহ্বানের কাছে টেঁকে না সে সব। সুতরাং তরুণ তখন সক্রিয়ভাবে গান্ধীবাদের পক্ষে, তার চোখে গান্ধীজিই গণ-জাগরণের স্রষ্টা ভারতে। অসহযোগ আন্দোলনের সেই গোড়ার দিকে ব্যবসায়ী বুদ্ধি-সম্পন্ন সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের অশুভাগমন হয়নি বলে যাঁরা আন্দোলনে নেবেছিলেন তাঁরা নিষ্ঠাবান ছিলেন ঐ ভাবাদর্শে।

১৯২৩ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে একবার শান্তিনিকেতনে যান। রবীন্দ্রনাথের নির্বস্তুক দৃষ্টিভঙ্গী কোনদিনই অন্ধ জাতীয়তাবাদ সমর্থন করেনি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কবির ছিল অসীম উদারতা, বিশ্বজনীনতা। আর কঠোর বাস্তববাদী গান্ধীজির ছিল সংকীর্ণ মনোভাব। তরুণ বিপ্লবীর মতে—"গান্ধীজির সুরে বাজছিল কেবল বর্তমান, আর কবির সুরে মিলেছিল অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।"

ক্রমেই বিদ্রোহী মনে মনে টের পেতে শুরু করল গান্ধীবাদের উপর গভীর আন্তরিক নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বের কোথায় যেন সংশয়ের কাঁটা এসে খচ্‌খচ্‌ করতে শুরু করেছে। প্রবল আবেগে চরখাকে গণ-সংযোগের একমাত্র মাধ্যম বলে গান্ধীবাদীরা চালাতে শুরু করল। এ ব্যাপারেই তরুণের মনে সংশয়ের দোলা লাগল, চরখা গণ-সংযোগের অন্যতম মাধ্যম হতে পারে কিন্তু একমাত্র মাধ্যম কেন হবে? নিজের মতেই তর্ক-বিতর্ক চলতে লাগল। তাছাড়া

গান্ধীজির সনাতন ধর্মের ভিত্তিতে চতুর্বর্ণভেদ স্বীকার করা সংস্কারমুক্ত তরুণের মনে ক্ষোভের উদ্রেক করল। বিদ্রোহীর নিজের কথাতেই বলি—"খিলাফৎ আন্দোলনকে আমাদের দেশের আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে গান্ধীজি যে ভয়ানক ভুলটি করেছিলেন সেটিও আমি বুঝতে পারলাম এই সময়ে।..... গান্ধীবাদের উপর আমার নিটোল বিশ্বাস এমনি করে টোল খেল" গান্ধীবাদী এই তরুণ ক্রমে হয়ে উঠতে লাগল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক মতবাদের শরিক।

বামপন্থী চিন্তাধারা তখনও ভারতে দানা বাঁধেনি, সবে শৈশবাবস্থা। এই তরুণ "The Socialist Fallacies", "Communist Manifesto"—ইত্যাদি পড়ে কমিউনিজমের পথই যথার্থ পথ বলে বেছে নেয়। ক্রমে শ্রেণী সংঘাতের মুখপত্র 'লাঙলের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে এই অভিজাত বংশের সুদর্শন তরুণটি। এখানেই মুজফ্‌ফর আহম্মদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে এর পরিচয়। 'লাঙলের' জন্যে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী এনে ছাপা হয়—

'জাগো, জাগো, বলরাম, ধরো তব মরুভাঙা হল
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।'

এ তরুণ চিন্তাবিদ্‌ থেমে থাকতে জানে না। যখন যা করে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গেই করে। তাই সে যত আন্তরিকতার সঙ্গে গান্ধীবাদ গ্রহণ করেছিল ঠিক ততটাই মর্মস্পর্শী গভীরতার সঙ্গে হয়ে উঠল এক নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট। দুই অবস্থাই সমান সত্য। এক মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মানসিকতায় পরিবর্তনে কোন খাদ নেই। আরোপিত নয়।

'লাঙলের' পর 'গণবাণী'। এই গণবাণীতেই প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ছাপায় এই বেপরোয়া বিপ্লবী। সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গণবাণীতেই ধারাবাহিক ভাবে লেখেন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার'-এর বাংলা অনুবাদ 'মা'।

সাহিত্যে তখন বাস্তবধর্মী চিন্তার ছাপ পড়তে শুরু করেছে। 'কালিকলমে' তরুণ প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু, সুবোধ রায় প্রমুখেরা নতুন দর্শনে অসাধারণ লেখা লিখতে শুরু করেছেন।

তখন ইউরোপের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে যোগাযোগ হত ফরাসী অধিকৃত পণ্ডিচেরীর মাধ্যমে। এম, এন, রায়ের চিঠিপত্র এসে পৌঁছলে এই জন্য বিপ্লবী গোষ্ঠী গোগ্রাসে পড়ে নিত। ভারতের বাইরে গিয়ে সরাসরি কমিউনিজম জানা দরকার মনে হতে লাগল এই বিপ্লবীর। ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে মস্কো যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল। এই তরুণটি যখন প্যারিস হয়ে বার্লিনে পৌঁছল তখন সে দেখল বার্লিন রীতিমত এক কেন্দ্র হয়েছে ভারতীয় বিপ্লবীদের।

বার্লিন থেকে বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মৌলানা বরকতুল্লা, চম্পকরাম পিল্লাই, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, আচারিয়া প্রভৃতি বহু বিপ্লবী ভারতে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করতেন।

তরুণের শেষ গন্তব্যস্থল মস্‌কো। ভারতীয় তরুণ কমিউনিস্টের যাতে মস্‌কো যাবার কোন প্রমাণ না থাকে তাই বার্লিনের সোভিয়েট দূতাবাস একটা সম্পূর্ণ অন্য কাগজে ভিসা দিলেন। এরপর এই ভারতীয় তরুণ বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন কারণে স্পেনসর, নারায়ণ ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়।

মস্‌কোয় বহু খ্যাতিমান স্বদেশী ও বিদেশী লোকের সঙ্গে পরিচিত হয় এই যুবক। এমন কি একবার মোতিলাল নেহেরু আর জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও দেখা হয়। আলাপও হয়। মস্‌কোতে এসে এই কম্যুনিস্ট বুঝলেন ভ্লাদিমির লেনিনের দেখানো উদার গণ-জাগরণের পথ অনুসরণ করে ষ্টালিন চলছেন না। তিনি লক্ষ্য করলেন, ষ্টালিনের মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা-লোভ এবং এই ক্ষমতালোভ থেকেই জন্ম নিল গণ-মগজ-

ধোলাইয়ের অদ্ভুত পদ্ধতি। শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা—জীবনের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় স্টালিন সুবিধাবাদের বীজ পুঁতেছিলেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে ডিক্টেটরশিপের সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও সোভিয়েট রাশিয়াতে যে কমিউনিজম তখন প্রচার হচ্ছিল তার সঙ্গে বাস্তবিক মিল ছিল ডিক্টেটরশিপেরই। এই জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার দরুণ মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা ব্যাহত হয় এবং তারই বিলম্বিত ফলশ্রুতি হিসাবে হয়ত সোভিয়েট রাশিয়ার পতনের মত এক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল। অন্যান্য কারণও থাকতে পারে কিন্তু এটি অন্যতম। এই ভারতীয় তরুণই জার্মাণ 'কুলটুর' সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ইংরাজী 'কালচারের' অর্থের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এই কুলটুরই নাৎসীবাদের ভিত্তি গড়তে সাহায্য করেছিল।

আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষ এত নিখুঁত বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী করবার ক্ষমতা রাখেন তিনি কিন্তু রাজনীতিবিদ্ হিসাবে আজকের মাপকাঠিতে কোন মতেই সার্থক বলে পরিগণিত হবেন না। অবশ্য এর কারণও তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করে বলেছেন—প্রথমতঃ তাঁর অনন্যসাধারণ স্পষ্টবাদীতা ও দ্বিতীয়তঃ পাটোয়ারী বুদ্ধির খামতি।

প্রিন্স দ্বারকানাথ থেকে কমরেড সৌম্যেন্দ্রনাথ—পাঁচ পুরুষের এই পারিবারিক ইতিহাস, ভারতের ইতিহাসে বিশ্বের দরবারে প্রকাশিত হওয়ার ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ, হিটলার, মুসোলিনি ও স্টালিনের সংস্পর্শে এসেও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী স্পষ্ট ব্যক্ত করে গেছেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে ভাবতে,—পূর্ণ রাজকীয় সামন্ততন্ত্র থেকে কঠিন বাস্তববাদী সমাজতন্ত্রে এই যুগান্তকারী উত্তরণ! মণিমুক্তোখচিত পাদুকা থেকে নগ্নপদ—একই পরিবারে সম্ভব হয়েছিল। দক্ষিণ থেকে বামপন্থী, চিন্তার আশ্চর্য বিবর্তন ও পরিবর্তন। কিন্তু প্রত্যেকটি পর্যায়ই নিখাদ!

বাঙালির ভাগ্য কথা বিশ্বনাথ ঘোষ

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি। পার্লামেণ্টে ভোট নেওয়া হল কোন ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে বলে। দেখা গেল সর্বাধিক ভোট পড়েছে সমান-সমান করে হিন্দি আর বাংলায়। তখন রাষ্ট্রপতির ভেটোয় এক ভোটে জিতে হিন্দি হল রাষ্ট্রভাষা। রাজেন্দ্র প্রসাদ কথা দিলেন ত্রিভাষা সূত্র থাকবে, সিডিউল্ড ১৫টি ভাষার সবকটিকে সমান যত্ন করা হবে, ইংরাজি অনির্দিষ্ট কালের জন্য 'লিঙ্ক' ভাষা হয়ে থাকবে ইত্যাদি।

কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে অনেক অবিচার ঘটালেন জহরলাল। যদিও ঐতিহাসিকদের মতে নিরীশ্বরবাদী হওয়াটা জহরলালের একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক গুণ ছিল। যার ফলে তাঁর কাছে সহজ হয়েছিল 'বিশেষ বিবাহ আইন' সমর্থন করা এবং ভারতে সর্বধর্মের নর-নারীর তার সাহায্যে বিবাহ করা। সেটা ভারতের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল এবং আজও আছে।

প্রশ্ন হল এত ভোট বাংলা ভাষার পক্ষে দিল কে?

বিহারের ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ বললেন—আধুনিক ভাষা হিসাবে ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষারই যোগ্যতা বেশি তাই অবাঙালিরাও বাংলা ভাষাকে ভোট দিয়েছেন।

এরপর শুরু হল বাঙলা ভাষার ওপর চোরাগোপ্তা আক্রমণ—জহরলাল-পত্নী কমলা নেহেরু ছিলেন টি, বি, রোগী। তাঁকে সেবা করে ইন্দিরাকে বিবাহের অনুমতি পেয়ে পার্শী যুবক ফিরোজ গান্ধী জো-হুকুম বলে বঙ্গভাষা বিরোধী হয়ে আসরে নামলেন—আরম্ভ হল আসামে বাঙালি খেদাও, ওড়িষ্যায়ও চলল সেই খেলা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আগে থেকেই বলে এসেছেন, বিহার ফর বিহারিজ। এবং উস্কানি দিতে থাকলেন দক্ষিণ ভারতকে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে চাকুরির জন্য বাংলা শিখতে এল। কারণ তখনও ছিল ভারতের সেরা কল-কারখানাগুলি কলকাতার আশেপাশে। সেই সময় অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে মোরারজী দেশাই-এর কাছ থেকে টাকা আদায় করে সমগ্র ভারতে বাংলাভাষা শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়। দুঃখের কথা তার মৃত্যুর পর নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমস্ত অর্থ ও আদর্শকে নষ্ট করে দিল কয়েকটি অসাধু লোক।

স্বাধীনতা অর্জনের সময় ভারতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিলেন নেতাদের মধ্যে—সুভাষচন্দ্র, জহরলাল ও বল্লভ ভাই প্যাটেল। এঁরা বাংলা ভাষার জন্য কিছু করেন নি। ইন্দিরা শান্তিনিকেতনের স্মৃতি নিয়ে কিছুটা করেছিলেন।

ভারতে মোগল পাঠানের কাছে বাঙালি যা পেয়েছে তার থেকে অনেক বেশি পেয়েছে ইংরেজের কাছে। ইংরেজই বাঙালির ভাল-মন্দের শিক্ষাগুরু। আর গুরুমারা বিদ্যের জন্যই বাঙালির লড়াই হয়েছে ইংরেজের সঙ্গে। সারা ভারত সেটা দেখেছে।

বাঙালি যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ করে আনন্দে অধীর তখন ইংরেজ নিঃশব্দে তার প্রথম রাজধানীটি দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছে। সেটা রোধ করার জন্য বাঙালি সেদিন কোন আন্দোলন করেনি কিন্তু করা উচিত ছিল। বৃটিশ আমলা—স্যার রেজিনাল্ড ম্যাক্সোয়েল এদেশে প্রগতিশীল চিন্তার নামে কমিউনিজমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিলেন। আজ সে সব কথা বেশি না বলাই ভাল। অনেকের তাতে গোঁসা হতে পারে।

এখন সব কথা চিন্তা করেই আমাদের পথ চলতে হবে। নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন বাঁচুক, বাংলা ভাষা রক্ষা পাক, অনুরাগ পত্রিকা দীর্ঘজীবি হোক।

আধুনিক ভারতে যে সব সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে বাংলার তুলনা করা এখনও অশোভন।

এবার কলকাতার দুটি প্রধান সংস্কৃতি কেন্দ্রর কথা বলে ব্যক্তব্য শেষ করছি ১। ক্লাইভের দেওয়ান রাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কথা আর ২। কুইন ভিক্টোরিয়া-সমাদৃত প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা। প্রথমটি মূলত বাংলায় সমৃদ্ধ আর দ্বিতীয়টি সারা বিশ্বে বিস্তৃত। প্রথম দলে যোগ দিয়ে কিছু বাঙালি শুরু করেছেন—সুতানুটি উৎসব। এরপর জোড়াসাঁকো উৎসবে কারা যোগ দেন দেখা যাক।

দেখি বাংলার মুখ প্রতুল মুখোপাধ্যায়

আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই
আমি আমার 'আমি'কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর।
বাংলা আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের সুখ
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই
আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি বাংলায় জেগে রই
আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার
আমি সর দেখেশুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চীৎকার
বাংলা আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীরধনুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

আমি বাংলায় ভালবাসি আমি বাংলাকে ভালবাসি
আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি
আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধায়
মেশে তেরো নদী সাত সাগরের জল গঙ্গায় পদ্মায়
বাংলা আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

সৌজন্যে 'পর্বান্তর'।

কেমন আছি

সনৎকুমার মিত্র

যখন কেউ জিজ্ঞাসা করে
'কেমন আছ হে ?'
তখনই নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল পড়ে
আমি চমকে উঠি।

মুখে বলি, 'ভাল আছি'
কিন্তু মনে মনে ভাবি
সত্যিই কি আমি ভাল আছি
আমি কি এই রকম থাকতে চেয়েছি ?

অন্যরকম থাকার জন্যে
কিছুক্ষণ দ্রুত হেঁটে যাই
তারপর····· ? সব ভুলে
ধীরে ধীরে ভিড়ে মিশে যাই।

চৌদ্দশত সাল

মঈনুল ইসলাম চৌধুরী

'১৪০০ সাল' কবিতার প্রেক্ষিতে

সুবর্ণ প্রত্যাশা নিয়ে সমাগত চৌদ্দশত সাল
হারানো দিনের বুকে মৌন-মূক নানারূপ স্মৃতি,
সকল ব্যর্থতা শেষে জন্ম নেয় উদ্যমের প্রীতি
নন্দিত কর্মের যোগে দৃপ্ত হয় কাল থেকে কাল।

চৌদ্দশত সাল সে ত স্বচ্ছপ্রাণ কবির আকূতি ঃ
সে-কবিতা ব্যাপ্ত এক পলিলিপ্ত দীপ্তিমান সুর ;
সর্বব্যাপী ধূসরতা সবখানে উদ্ধত অসুর—
জীবনে জীবন নেই মূর্ত শুধু কপটের স্তুতি।

তবু কবি নিষ্ঠাবান নির্মাণের অপার্থিব সুখে
ক্রমে-ক্রমে ঋদ্ধ হয় কবিতার নির্মল ভুবন,
চারু কাব্য পাঠে আজ বাঙময় রুচিস্নিগ্ধ মন
প্রাণের উৎসব হোক প্রপীড়িত পৃথিবীর বুকে।

চৌদ্দশত সাল আনে আগামীর প্রত্যয়ী আহ্বান
কল্যাণের দৃঢ়তায় অশুচির হোক অবসান।

আসা যাওয়ার পথে

বিউটি মজুমদার

দুঃখের নুড়ি নিয়েছি কুড়ায়ে
জীবনের আঁচল ভরে।
সুখের উপল দুহাতে দিয়েছি,
ছড়ায়ে পথের পরে।

ফিরে যবে যাব দুপাশে মাড়াব
সুখের উপল দানা
আঁচলের নুড়ি ফোটাবে সে কুঁড়ি
রাতের হাসনুহানা।

উতল সে গন্ধ দেবে হাতছানি
আবার আসব নেমে
অসীম কালের পাল্‌কিতে চড়ে,
যাবরে একটু থেমে।

কী জানি কখন বিভোল এমন
ক্লান্তিতে একথা ক'বে
এবারটি যাব নিজ নিকেতনে
ফিরবনা আর ভবে।

ইচ্ছে হয় যাই শশধর ভট্টাচার্য্য

কেউ না কেউ আছ আমায় ভালবাসে। অন্তত একজন হলেও কেউ অপেক্ষায় থাকে। নিয়ে ভাতের থালা, জলের বদনা হাতে। কেউ না কেউ অশ্রুতে ভাসে অনায়াসে ডুব দেয় তলে পুকুরের জলে। গিয়ে মায়া রাক্ষুসীর কাছে করে প্রাণ ভিক্ষে। আর ঐ যে তন্তুজ মেয়েটি বাঁহাত কোমরে ঠেকা দিয়ে ডান হাতে রেলিংটা ধরেছে। মখমলে মুখ বুকটাকে সামনের দিকে ছুড়ে দিয়ে। হারিয়ে গেল বাইরের জানালায়।

পরণে ছিল সেমিজ অথবা স্কার্ট। চেহারা সে কী তার... ঝকঝকে স্মার্ট। তার উপরে ঈষৎ সবুজ টপস কি ব্লাউজ মেটুয়াবুরজ হাসির সাথে আনন্দের সিম্ফনী ছুটেছে। যেন কোন্ হোলি উৎসবে ডেকেছে বান্। ছিটায়েছে আবীর হাতের তুড়িতে। সোনালী সবুজ লালরঙা, যেন সাতরঙা ধেনু এসে মিশেছে, সিয়াচেন হিমবাহে।

ইচ্ছে হয় যাই। নেচে নেচে যাই তারই হাত ধরে। তুষার ধবল ঐ পাহাড়ে, তুষার মানবের দেশে অথবা জাহান্নামে।

ফিরে পাওয়া শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

মনে বড় সাধ—'ভালবাসি',
আবার নতুন করে ভালবাসি
পুরোন ভালবাসার পৃথিবীকে।
জরায় পীড়িত মনে
আবার রঙ ধরাক,
সুস্থতার সবুজ যৌবন।

আবার ভালবাসি,
ভালবাসি ফসিল হওয়া একঘেয়েমি,
মিটিং, মিছিল, মহানগর
বস্তি আর জনতা ;
সমস্যার জট, সাথে সমাধানের ব্যস্ততা।

ভালবাসি শুধু ভালবাসি—
তোমার আমার আজন্মের বিরোধ
হিমালয়-সমুদ্রের ফারাকে দূরত্বের মিলন ;
বহু যুগ ধরে বয়ে বয়ে বেড়ান অমিলের ছন্দে
মিল খোঁজার ভীষণ অসম্ভবের প্রয়াস।

তবু বড় সাধ বুক ভরে
নিঃশ্বাস আটকে রাখি
নতুন ভালবাসার অক্সিজেনে॥

শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় বাগচী

ইদানিং ফুল ফুটলেই ঝরে যায়—
যেমন এখনকার দেখা স্বপ্ন
দানা বাঁধে না
শিশিরের বিন্দুগুলো যেন ছোট ছোট স্মৃতি
কৈশোর, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্বের—
জমতে জমতে কখন যে চুয়ে পড়ে
টেরই পাই না।

অথচ মধ্যরাতে জ্বলতে জ্বলতে
নিভে যায় দীপ
যেন প্রজ্বলিত হয়ে কোনো এক সূর্যাস্তের
অপেক্ষা করা—নিষিদ্ধ ঘোষণা
তাবৎ মূল্যবোধের পলেস্তরা কখন যে খসে যায়

শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজও বোঝা গেল না ॥

রাখাল বালক বাঁচিয়ে দিল হাজার প্রাণ

—রেখা পাল

বিবেক বিরোধী স্থূল অবদানে
জাগে কি কোন আত্মজ্ঞান,
আত্মশক্তি ক্ষয় হলে কি
বাঁচতে পারে বিবেকবান ?
তাইতো বুঝি বা শত-সহস্রে
একজনই চায় মুক্তি-স্নান—
দৈবেও নয় দানবীয় নয়
শুধু মানবিক আছে উজান,
শুদ্ধির স্রোতে মোহনার দিকে
পাড়ি দিতে চাওয়া অনঘ প্রাণ।
প্রত্যাশা তারও মহিমে অসীমে
পূর্ণাহুতির অমোঘ টান,
অন্তঃলগ্নে বেজে ওঠে এমনই
সে এক প্রালেয় গান।
শ্রুতি দিশা ভরে গূঢ় অনুভবে
চিহ্নিত হয় সে যে মহান,
রাখাল বালক সহন বিবেকে
বাঁচিয়ে দিল হাজার প্রাণ।

মহিম হালদার স্ট্রীটের ছেলে

পুলকেশ শাণ্ডিল্য

মহিম হালদার স্ট্রীটের ছেলে শ্রীশঙ্কর রায়চৌধুরীর ছোট-বেলা কেটেছে এই পাড়াতে অর্থাৎ 'অনুরাগ' দপ্তর থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে। পাড়ার 'গরমিল সঙ্ঘ' তাই সেনাধ্যক্ষ শঙ্কর রায়চৌধুরীকে স্বাগত জানাবার জন্যে নতুন সাজে সেজে পাড়ার সকলকে সামিল করেছে এই আনন্দ মেলায়। তিনি আজ বাঙালীর গর্ব।

১৯৩৭ সালের ৬ই সেপ্টম্বর কলকাতায় জন্মেছেন জেনারেল রায়চৌধুরী। পৈতৃক বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার টাকির কাছে সৈয়দপুর গ্রামে। লেখাপড়া কলকাতার সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুলে ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত। বাবা সুনীল রায়চৌধুরীর চাকরি ছিল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে, পরে স্টেট ব্যাঙ্ক। বাবা বদলি হয়ে যাওয়ায় পুত্রকে সিনিয়র কেম্ব্রিজের ফাইনাল পরীক্ষা না দিয়েই চলে যেতে হয় মুসৌরি। মুসৌরিতে গিয়েই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হবার জন্যে নিজেকে তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ হলেন।

ছোটবেলায় সেনাবাহিনীর অফিসারদের স্মার্ট চৌকস ভাবভঙ্গি, নিখুঁত পোষাক-পরিচ্ছদ তাঁকে অত্যন্ত আকর্ষণ করে। সেই সময়ে মুসৌরীতে জয়েণ্ট সার্ভিস উইংয়ের একটা বক্সিং টিম এসেছিল। তিনিও তখন বক্সিং শিখতেন। সেনাবাহিনীর বক্সিংটিম দেখেই তিনি ঠিক করে ফেললেন সেনাবাহিনীতে যোগ দেবেন। দেরাদুনে মিলিটারি একাডেমিতে দু-বছর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ১৯৫৭ সালে তিনি যোগ দেন সেনা অফিসার পদে। এখন তিনি ভারতীয় সেনার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত।

এই বছর ২১ নভেম্বর তিনি হলেন সেনাধ্যক্ষ। তিনি বিনয়ী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভদ্র এবং খাঁটি বাঙালি। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়ও বিনয়ী এবং অতিথিপরায়ণ। তাঁদের পূর্ব নিবাস ছিল পাবনা জেলায়।

সেনাধ্যক্ষ শঙ্কর আজ কালীঘাট পাড়ায় এসেছিলেন ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৪, আজ তাঁর বয়স হয়েছে ৫৭ বছর ৩ মাস ১৮ দিন। আমরা তাঁর সুদীর্ঘ কর্মসফল জীবন কামনা করি।

পুস্তক পরিচয় কৃষ্ণস্বামী

শিখিপাখা—হরি ভট্ট। বাচস্পতি প্রকাশনী, দক্ষিণ বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা। পঁচিশ টাকা।

এই কাব্য সংকলনের দুটি অংশ। প্রথম অংশ 'সবুজ' দ্বিতীয় অংশ 'প্রাপ্ত'। ছোটদের জন্য লেখা ছড়া কবিতা আধপাগলা সমরেশ, মেঘ নাকি শালপাতা খায়—আমাদের ভাল লেগেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা শতাধিক কবিতার মধ্যে আঁধারের নিশি হলো ভোর, চরণের ধূলি আর তৃণ হতে চাই এবং কর্ণের আক্ষেপ রীতিমত বলিষ্ঠ কবিতা। 'শিখিপাখা' কাব্যসংকলনের জন্য আমরা কবি হরি ভট্টকে ধন্যবাদ জানাই।

ধ্রুবব্রতে অগ্নিবর্ণ স্বাদ—রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। গ্রেট বেঙ্গল প্রকাশনী। ২৭, রামনারায়ণ পল্লী, কলকাতা—৬১, পাঁচ টাকা।

এই তরুণ কবি প্রায় পাঁচিশ বছর ধরে কবিতা চর্চা করছেন। স্কুলের ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর কবিতায় হাতেখড়ি। আমরা তখন থেকেই তাঁকে লক্ষ্য করছি। এখন তিনি রীতিমত সিদ্ধহস্ত। এই সংকলনের পূর্বে তাঁর 'আত্মস্থ সংলাপ'ও আমরা শুনেছি, শুনে তৃপ্ত হয়েছি। কবির উপলব্ধি,—খড়কাটা শেষ, মাঠে নিম্নচাপ রেখে গেছে মুনিষের শব / ঘরে আছে মুমূর্ষু মানুষ।···কবির প্রত্যয় দৃঢ়, শব্দচয়ন পরিমিত, ভাব আধুনিক, বক্তব্য আন্তরিক। বাংলা কাব্য-সংসারে তাঁর আসন পাকা হতে বাধ্য।

ম্যাডাম ক্ষমা করো—বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। প্রকাশক স্মিতা আচারিয়া, ৪৩।বি, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫। মূল্য উল্লেখ নেই।

অনুরাগের পাঠকগণ বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্যকে 'রবিদা' রচনার মাধ্যমে বিলক্ষণ চেনেন। তাঁর হাত মিষ্টি। সেই হাতে তিনি চোখের জল মিশিয়ে এই বই পরিবেশন করেছেন। এই উপন্যাসোপম আত্মজীবনীমূলক রচনা পড়ে আমাদের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদভ্রান্ত প্রেমে'র কথা মনে পড়ে। রচনার প্রসাদগুণ তো আছেই, এর কাগজ এবং ছাপাও খুব সুন্দর।